সাগরপারের উৎসব

সুমনা সাহা

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি (২০১৮) আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম বৈভবের স্বর্গরাজ্য আমেরিকায়। শিকাগো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে ধরলাম অন্তর্দেশীয় ছোট বিমান—পৌঁছলাম ডিময় (Des-Moines)। এয়ারপোর্টে নামতেই এক অপরিচিত ঠান্ডা হাওয়া গাল ছুঁয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে কানে কানে বলল, ''এসো, স্বাগত!'' তারপর হাড়ে হিমেল স্রোত বইয়ে দিয়ে চপলা কিশোরীর মতো ছুট লাগাল। টের পেলাম, এ-ঠান্ডা তো আমার জানাশোনা ঠান্ডার জ্যাঠাইমা! তখন বিকেল। সূর্যদেব পশ্চিমে যাত্রা করেছেন। আকাশে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ আলো। সেই কনকনে ঠান্ডা, সেই মিষ্টি কনে-দেখা আলো, দূর থেকে আমাদের দেখে খুশি-উপচানো চোখে ছেলের হাত নাড়া—সব মিলিয়ে মনে 'খুশির তুফান' উঠছিল। ছেলে অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটে চলল 'ইউনিভারসিটি সিটি' আইওয়া-র দিকে। রাস্তার দুধারে লাল-হলুদ-সবুজ পাতাওলা গাছের সম্ভার যেন এক চোখজুড়ানো রঙের উৎসব! সর্বত্র নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা, মানুষের অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণ মন কেড়ে নেয়। গাড়ি শহর ছেড়ে যত ভিতর দিকে ঢুকছে, ততই বসতির চিহ্ন কমে আসছে, দুদিকে শুধু ভুট্টা খেত, আর ঢালু ছাদওয়ালা ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। ছোটবেলায় যেমন একটা চৌকো বাক্স ও তার মাথায় ত্রিভুজ বসিয়ে বাড়ি এঁকে ফেলতাম আর লাল-নীল প্যাস্টেল রং দিয়ে ভরিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াতাম, মা 'দারুণ হয়েছে' বলে 'ভেরি গুড' দিয়ে দিতেন—আমিও ছেলেবেলার ওই ছবি আঁকবার খাতাটাকে পথের দুধারে খুঁজে পেয়ে প্রাণভরে 'ভেরি গুড' দিতে দিতে চললাম।

আমি বসেছি পশ্চিমি দুনিয়ার দুটি বিশেষ উৎসবের কথা লিখব বলে। গবেষণার কাজে ছেলে আমেরিকাতে থাকায় আমরা বেশ কয়েকটা মাস ওখানে কাটিয়েছিলাম। ফলে খুব কাছ থেকে ওদেশের খাওয়াদাওয়া, জীবনযাত্রা, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা উৎসব দেখার ও তাতে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ হল।

গোটা আমেরিকা জুড়ে বছরের শেষ তিনটি মাসে পরপর থাকে তিনটি বড় উৎসব—অক্টোবরের শেষে 'হ্যালোইন'; নভেম্বরের শেষে 'থ্যাংকস গিভিং' ও ডিসেম্বরের শেষে 'বড়দিন' বা 'খ্রিস্টমাস সেলিব্রেশন'। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি

থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছিলাম ওদেশে। ফলে তিনটি উৎসবই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বড়দিনের উৎসব পৃথিবী জুড়ে সকলেই জানে ও পালন করে। তাই সেটা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য। অন্য যে-দুটি উৎসবের কথা লিখব বলে কলম ধরেছি, তাদের সম্পর্কে অনেকেরই খুব বেশি জানাশোনা নেই।

হ্যালোইন

আমেরিকায় বছরের সবচেয়ে ভয়ের দিন হ্যালোইন। যদিও ব্যবসায়ীদের কাছে এ এক আশীর্বাদ। কারণ এই উৎসব উপলক্ষ্যে যত অদ্ভুতুড়ে কস্টিউম (সাজপোশাক), ক্যান্ডি ও চকোলেট বিক্রি হয়, তা রেকর্ড তৈরি করে। এই হ্যালোইন-জ্বর কেবল আমেরিকা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকে না—বিশ্ব জুড়ে নানা বিচিত্র রকমে এই ছুটির দিনটিকে পালন করা হয়।

স্কট কবি রবার্ট বার্নস-এর লেখা 'হ্যালোইন' (১৭৮৫) কবিতা থেকেই প্রথম এই নামটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শব্দের উৎসগত দিক থেকে দেখলে, এর দুটি ভাগ—প্রথমটি হল 'হ্যালো', যার অর্থ 'হোলি ম্যান', অর্থাৎ পবিত্রাত্মা সাধু-সন্ত। ইংরেজি 'হ্যালো' শব্দের অর্থ হল আলো বা জ্যোতি। চৈতন্যালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আমরা বলি মহাপুরুষ বা মহামানব এবং তাঁদের অন্তরের জ্যোতির উদ্ভাস বোঝাতে তাঁদের ছবিতে মাথার চারপাশ ঘিরে একটি জ্যোতির্বলয় এঁকে দেওয়া হয়। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সাধু-সন্তদের শ্রদ্ধা জানানোর দিনটি হল নভেম্বর মাসের প্রথম দিন, এই দিনটি 'অল-হ্যালোজ ডে' নামে বিখ্যাত। খ্রিস্টানরা পরলোকগত আত্মাদের শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানটিও ওই একই দিনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর ঠিক তার পরের দিন, অর্থাৎ ২ নভেম্বরকে ধার্য করা হয়েছে 'অল সোলস ডে', অর্থাৎ মানুষ, জীব-জন্তু সর্বপ্রকার প্রাণীই এর আওতায় পড়ে। উনিশ শতকে আমেরিকায় আইরিশ অনুপ্রবেশের সময় বিশেষত, ১৮৪০-এ আয়ার্ল্যান্ডের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের পর বিরাট আইরিশ জনগোষ্ঠী যখন আমেরিকায় আশ্রয় নেয়, তখন তাদের সঙ্গে আমেরিকায় আসে 'হ্যালোইন'। 'হ্যালোইন'-এর দ্বিতীয় ভাগ হল—'ইন', যা 'ইভ'-এর সংকুচিত রূপ, অর্থাৎ আগের দিন। যেমন খ্রিস্টমাস ইভ মানে ২৫ ডিসেম্বরের আগের রাত্রি অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর, ঠিক সেভাবেই 'অল সেন্টস ডে'-র আগের রাত, ৩১ অক্টোবর হল 'হ্যালোইন'। এই দিনটি আমেরিকার ক্যালেন্ডারে অন্যতম একটি বাৎসরিক ছুটির দিন।

হ্যালোইন-এর প্রাচীন উৎস

আজ পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা ৩১ অক্টোবর রাত্রে 'হ্যালোইন' উৎসবে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তারা এর প্রাচীন কেলটিক উৎস—'সো-ইন' (Samhain-এর উচ্চারণ করা হয় Sow-in) উৎসবের কথা জানে না। আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে, কেলটিক জাতির পূর্বপুরুষগণ বিশ্বাস করতেন যে, বছরের উজ্জ্বলতর আলোকিত অংশ (গ্রীষ্মকাল) ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অপেক্ষাকৃত কম আলোকিত অংশ (শীতকাল)—এই দুই ভাগের মধ্যবর্তী বিভাজন রেখাটি হল 'সো-ইন'। 'সো-ইন'-এর সময় মর্ত্যলোক ও প্রেতলোক বা বিদেহলোকের মাঝের পর্দাটা একেবারে পাতলা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে মৃত আত্মারা সেই পর্দা ভেদ করে মনুষ্যলোকে ঢুকে পড়ে, দেহধারী জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে মিশে গিয়ে ঘোরাফেরা করে। অনেকসময় তারা ছদ্মদেহ ধরে আসে, আবার পশুপাখির রূপে, বিশেষ করে কালো বেড়ালের রূপ ধরে আসে। তাই ওই ভূতদের তাড়াবার জন্য ও পৃথিবীতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার জন্য লোকে বনভোজনের আগুন

জ্বেলে ও নানা কিম্ভূতকিমাকার সাজপোশাক পরে উৎসব করে। সেই থেকে সো-ইন প্রাচীন কেলটিক জাতির উৎসবে পরিণত হয়।

কেলটিক ক্যালেন্ডারে বছর শেষ ও শুরুর সন্ধিক্ষণ সূচক এই উৎসব। আমেরিকা ও ইউরোপে অনেক কাল আগে এই দিনটিই ছিল 'নিউ ইয়ার্স ইভ'। কেল্টদের চারটি প্রধান উৎসবের মধ্যে 'সো-ইন' অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব আইরিশ জাতির মানুষের কাছে সো-ইন-এর প্রতীকী তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠান্ডা মরশুম শুরুর এই সময়টিতে সূর্যের আলোর তেজ কমে আসে। বহুকাল পূর্বে মানুষ ভাবত, আকাশপথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সূর্যের বুঝি শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তারা চিন্তিত হত, একে অশুভ মনে করত, আর সূর্যকে একটু তাপের জোগান দিয়ে সাহায্য করার জন্য পাহাড় চূড়ায় এক বিরাট আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করত। এই হল প্রাচীন সো-ইন উৎসবের গোড়ার কথা। শীত ঋতুর আগমনে প্রকৃতি সজীবতা হারায়। ঘাস, গাছের পাতা সব সাদা বরফে ঢেকে যায়। অধিকাংশ গাছই পাতা ঝরিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। যে-সমস্ত চিরহরিৎ বৃক্ষে পাতা থাকে সারাবছর, তাদের সবুজও বরফে ঢাকা পড়ে। বৈধব্যের শ্বেত বসনের মতো রিক্ততার চিহ্ন বহন করে প্রকৃতি যেন বলে, ''দেখো, যৌবন নশ্বর। ক্ষয় প্রকৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। সময়ের কাছে আমরা সবাই কত অসহায়!'' ধরণীতে আগুন হল সূর্যের বিকল্প। তাই এই আগুন জ্বালানো প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তার প্রতীক। সূর্য এইসময় অশুভ শক্তির এলাকায় ঝুঁকে পড়ে—অতএব অশুভ শক্তি এই সময় সক্রিয় হয়ে উঠবে। কেল্টিক পৌরাণিক গাথায় মৃত্যুলোকের দেবতা বা অপদেবতাদের রাজাকে বলা হয় ডন। তাঁর উপর সূর্যের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ডন এই সময় তার সমস্ত ভূতপ্রেত চেলাচামুন্ডা নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ান।

ডন এক অবসরপ্রাপ্ত দেবতা। তিনি অন্যান্য দেবতাদের থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকতে ভালবাসেন। ডন নামের অর্থ ব্রাউন, অর্থাৎ বাদামী, যা সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী রং, তাই মৃত্যুলোকের ছায়াময় জগতের দ্যোতক। নবম শতকের একটি লিপিতে এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়—''মৃত্যুর পরে তোমরা আমার গৃহে আসবে, আমার কাছে বাস করবে।'' ডনের ঘরে সব মৃত আত্মারা একত্রিত হয়, বিভিন্ন গ্রন্থে এরকম উল্লেখ আছে। যে সমস্ত জেলেরা মাছ ধরা নৌকা নিয়ে আয়ারল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় এসে পড়ে, তারা যদি দেখে, পাশ দিয়ে কোনও অদ্ভুত অচেনা নৌকা নির্জন দ্বীপের দিকে চলেছে এবং শুনতে পায় যে, তারা যেতে যেতে তীরে নেমে যাওয়া ব্যক্তিদের নাম ধরে ধরে ডাকছে, জেলেরা সে-ডাক গ্রাহ্য করে না। তারা জানে যে সেগুলি অশরীরী ডাক। পরবর্তী কালের খ্রিস্টান সাহিত্যিকগণ বলেছেন, নরকের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে মর্ত্যে নিজের বাড়ি ও পরিবারের জন্য মৃত আত্মাদের প্রাণ টানে। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা 'ডেভিল' অর্থাৎ শয়তানের চরিত্র অঙ্কনে এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তি-রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন।

আমেরিকায় 'হ্যালোইন' জনপ্রিয় হওয়ার আগে আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন কেলটিক উপজাতির মানুষ ৩১ অক্টোবর দিনটিতে পাগানদের (যারা খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসী নয়) সো-ইন ছুটি হিসাবে পালন করত, উৎসব চলত তিন দিন ধরে।

আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলে তিনদিনের 'সো-ইন' উৎসব তিনটি ভিন্ন নামে চালু হল—৩১ অক্টোবর—অল হ্যালোজ ইভ, ১ নভেম্বর—অল সেন্টস ডে, ২ নভেম্বর—অল সোলস ডে। মূল পাগান সো-ইন এই খ্রিস্টীয় নব উৎসবের মেজাজের সঙ্গে অবাধে মিলিত হলেও কেল্ট জাতির অতীত গৌরব ও

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সো-ইনের মর্যাদা রক্ষায় আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে 'অল হ্যালোজ ডে' বা 'হ্যালোইন' বেশি গুরুত্ব পেল এবং নতুন নতুন প্রথা উৎসবের অঙ্গ রূপে যুক্ত হয়ে গেল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ আত্মাকে তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত প্রতীকেও পরিবর্তন হয়েছে। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে মিষ্টি আলু (টারনিপ) ব্যবহার করা হত। আমেরিকার আদিবাসীরা পাম্পকিন (বড় জাতের কুমড়ো) ব্যবহার করত, এখন বিশ্ব জুড়ে এটাই চালু হয়েছে। ভুট্টার খড় ও কাকতাড়ুয়া অশুভ শক্তি বিদায় করতে ব্যবহৃত হয়। হ্যালোইনের দিন বিশেষভাবে যে-রঙের পোশাক পরা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান কালো, বেগুনি ও উজ্জ্বল কমলা রং। আমরা আইওয়া শহরের অলিতে গলিতে প্রত্যেক বাড়ির সামনে, উঠোনে, রেস্তোরায়, পার্কে, এমনকী পথের ধারেও নানা আকারের কুমড়ো, ভুট্টার খড়ের কাকতাড়ুয়া ইত্যাদি সাজানো দেখেছি। কুমড়োর আকারের বেলুন দিয়েও কোথাও কোথাও গৃহসজ্জা দেখেছি।

তখনকার দিনে বংশের পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে সম্মান জানানো ও অশুভ প্রেতাত্মাদের প্রভাব দূর করা হ্যালোইন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সেদিন ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলে রান্না হত না। খোলা আকাশের নিচে একটি বড় আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হত। একে বলা হয় 'বনফায়ার'। বন-মোরগ, খরগোশ, ভেড়া প্রভৃতি পশু ওই আগুনে ঝলসে খাওয়া হত। মৃত পশুর হাড়গোড়গুলো ওই আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হত এবং ওই জ্বলন্ত হাড়ের এক-এক টুকরো প্রত্যেকে বাড়িতে নিয়ে যেত। পরের দিন ওই হাড়ের টুকরো দিয়ে রান্নার জন্য উনুন ধরাত। মন্ত্রপূত কাঠের মতো ওই হাড়ের টুকরো অশুভ শক্তিকে দূরে রাখবে বলে লোকে বিশ্বাস করত। এখনও এই প্রথা আছে একটু পরিবর্তিত রূপে। পশুর হাড়ের বদলে ওই উৎসবের আগুনের পোড়া কাঠ এক-এক টুকরো লোকে বাড়িতে নিয়ে যায়। সময়ের পলি হ্যালোইনের সঙ্গে আরও প্রথা একত্রে জুড়ে দিয়েছে, যেমন আমেরিকার শস্য উৎসবের অঙ্গ পাম্পকিন (বড় আকারের মিষ্টি কুমড়ো) কাটা। বিশাল বড় বড় কুমড়োর মাথার দিকে ছুরি দিয়ে গর্ত করে ভিতরের শাঁস বের করে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর উপরে ছুরি দিয়ে নানা ডিজাইনে কেটে একটি বাতিদান হিসাবে সাজানো হয়। অনেক সময় উপরে এমন ভাবে কেটে চোখ-মুখের আকৃতি দেওয়া হয় যে, ওর ভিতরে আলো রেখে দিলে অন্ধকারে দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটি মানুষের মাথা বা মুখ, যার চোখ দুটো জ্বলছে। উপরে কাগজের প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকে, 'Bless us, Keep away, Go somewhere else' এর অর্থ, প্রেতাত্মা যদি ঘরে ঢুকতে চায় তো সে ওই বাইরে ফেলে রাখা কুমড়োর শাঁস খেয়ে তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ করে এখান থেকে দূরে চলে যাবে।

আয়ারল্যান্ডে ছোট ছেলেমেয়েরা বড় আলু ও মিষ্টি আলুর ভেতরটা চেঁছে পরিষ্কার করে তার মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে তৈরি করে 'জ্যাকের লণ্ঠন'। কী এই 'জ্যাকের লণ্ঠন'-এর নেপথ্য ইতিহাস? জানার চেষ্টা করতে গিয়ে উঠে এল এক প্রাচীন উপকথা—যার মূল মর্ম বিশ্বের সব দেশের সর্বজনীন নীতিকথা—''সৎ জীবনযাপন করো। অসৎভাবে জীবন কাটালে পরিণাম দুঃখময়''।

'জ্যাকের লণ্ঠন'

অনেক কাল আগে, আয়ারল্যান্ডের এক গ্রামে বাস করত জ্যাক নামে এক হাড়কিপটে দুষ্টু লোক। লোককে ঠকিয়ে পয়সা আদায় করা ও সেই পয়সায় মদ খাওয়া, ফুর্তি করা—এই ছিল তার কাজ। জ্যাকের কান্ডকারখানা ক্রমে শয়তানের রাজার

(Devil) কানে উঠল। এক রাত্রে ডেভিলের দূত শয়তান (Satan) জ্যাকের যাতায়াতের পথে একটা পাথরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল। আমাদের দেশের যমরাজ যেন ওদেশের ডেভিল, আর যমের দূতের মতো ডেভিলের চেলা শয়তান। জ্যাক অনেক রাত্রি করে নেশায় চুর হয়ে ফিরছিল। পথে একটা পাথরের গায়ে পা ঠেকতেই তার ভিতর থেকে বিচিত্র শব্দ করে উঠে দাঁড়াল শয়তান। জ্যাক প্রমাদ গণল, সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুঝল, শয়তান এসেছে তার প্রাণ নিতে। তখন শয়তানকে ঠকানোর একটা বুদ্ধি বের করল। বলল, ''তুমি আমার প্রাণ নিয়ো, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মরার আগে ভাল করে একটু মদ পান করে গলা ভেজাতে চাই।'' শয়তান নরম হল। তাকে নিয়ে গেল গ্রামের সবচেয়ে ভাল সরাইখানায়। আকণ্ঠ মদ খেল জ্যাক। দাম মেটাবার সময় যথারীতি তার পকেট ফাঁকা! সরাইখানার মালিক তো রেগে অগ্নিশর্মা। জ্যাক তখন শয়তানকে বলল, ''তোমার পক্ষে তো যে-কোনও রূপ ধরা বাঁ হাতের খেল। তুমি একটা রুপোর মুদ্রা হয়ে যাও। আমি দাম মিটিয়ে দেওয়ার পরে আবার নিজের রূপে ফিরে আসবে।'' শয়তান জ্যাকের শয়তানি ধরতে পারল না। সে নিমেষেই একটা রৌপ্যমুদ্রা হয়ে গেল। তখন দুষ্টু জ্যাক তাকে নিজের পকেটে ভরে ফেলল। পকেটে ছিল একটা 'ক্রস', খ্রিস্টানরা 'ক্রস' চিহ্নকে অতি পবিত্র মানে। ক্রসের পবিত্র সংস্পর্শে শয়তানের জাদু কাজ করল না। সে মুদ্রা হয়ে জ্যাকের পকেটে ঘুরতে লাগল।

এভাবে বেশ কিছুদিন গেল। শয়তান জ্যাকের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করতে লাগল। তখন জ্যাক এক শর্ত দিল—আগামী দশ বছর সে জ্যাকের ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। জ্যাকের শর্ত মেনে নিয়ে শয়তান নিজের ডেরায় ফিরে গেল। জ্যাকের লোক-ঠকানোও আগের মতোই চলতে লাগল। অবশেষে দশ বছর পরে আবার এক অন্ধকার রাত্রে বাসায় ফেরার পথে জ্যাকের পথ আগলে দাঁড়াল শয়তান। আঁতকে উঠল জ্যাক—''কী সর্বনাশ! এরই মধ্যে দশ বছর ফুরিয়ে গেল!'' কিন্তু শয়তান তো এবার তার প্রাণ নিয়েই ছাড়বে। সে আবার একটা ফন্দি বের করল। সামনেই একটা আপেল গাছের সবচেয়ে উপরের ডালে একটা আপেল ফলেছিল। কাঁচুমাচু হয়ে সে বলল, ''এবার তো যেতেই হবে। তবে বড্ড খিদে পেয়েছে। যাওয়ার আগে ওই গাছ থেকে একটা আপেল পেড়ে দাও না, খেয়ে মরি।'' শয়তান মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছা মনে করে বিরাট সেই আপেল গাছের মগডালে ফলে থাকা আপেলটা পেড়ে আনতে একলাফে গাছে উঠল। অমনি জ্যাক দুটো বড় বড় গাছের ডাল ক্রসের মতো করে গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে দিল। শয়তান ওই ক্রস দেখে আর নিচে নামতে পারে না। সে বুঝল, জ্যাক আবারও তাকে ঠকিয়েছে। এবার সে প্রতিজ্ঞা করল, ''ছেড়ে দাও জ্যাক, কথা দিচ্ছি, কোনওদিন তোমার প্রাণ নিতে আসব না।'' জ্যাক তাকে তিন সত্যি করিয়ে মুক্তি দিল। এবার সে অবাধে যত রাজ্যের কুকর্ম করে বেড়াতে লাগল। কালের নিয়ম অনুসারে একসময় জ্যাকের আয়ু শেষ হল। কিন্তু তার মৃতদেহ থেকে প্রাণ নিতে কেউ এল না। জ্যাকের আত্মা প্রথমে গেল স্বর্গরাজ্যে। আয়ারল্যান্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন সেন্ট প্যাট্রিক। তাই সেখানে স্বর্গের দরজায় তাঁর প্রহরা। তিনি জ্যাকের মতো দুষ্টু লোকের প্রাণকে স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। ব্যর্থ হয়ে জ্যাক চলে গেল শয়তানের রাজত্বে, পাতালে। শয়তান তাকে দূর থেকে আসতে দেখেই একটা জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে মারল। আর শাসিয়ে বলল, ''ফের যদি এদিকে আসিস, তোকে আস্ত রাখব না।'' নিরুপায় জ্যাকের জন্য স্বর্গ ও নরকের সব দরজা বন্ধ হয়ে

গেল। বেচারা তখন একটা রাঙা আলুর খোলের মধ্যে ওই জ্বলন্ত কয়লার টুকরোটা ভরে লণ্ঠন বানিয়ে নিল। একটু শান্তিতে মাথা গোঁজার স্থানের সন্ধানে অনন্ত কাল ধরে সে ওই লণ্ঠন হাতে শুভলোক ও অশুভলোকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজও। তাই আইরিশরা বলে, ''যদি অন্ধকার রাত্রে রাস্তায় শয়তানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, খবরদার, তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে গাছে চড়িয়ো না—তাহলে তোমাকে জ্যাকের মতোই সারাজীবন লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াতে হবে।''

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হাজার হাজার আইরিশ অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে এই গল্পটিও আমেরিকায় আশ্রয় নেয়। আমেরিকানরা সোৎসাহে সহকারে নতুন এই প্রথা 'হ্যালোইন'-কে আপন করে নেয়। তারপর আশির দশক থেকে হ্যালোইন আমেরিকার এক অন্যতম জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হল। ওইদিন সকাল থেকেই ঘন ঘন ডোর বেল বাজবে, যদি বাড়ির আশেপাশে প্রতিবেশীর গৃহে খুদে বাসিন্দা থাকে! আমাদের ঘরেও হানা দিয়েছিল একদল বিচ্ছু। আগে থেকেই বন্ধুরা জানিয়ে দিয়েছিল, বিদঘুটে সাজ-পোশাক করে যদি বাচ্চারা কলিং বেল বাজিয়ে বলে, 'ট্রিক অর ট্রিট?' তাহলে অবশ্যই তাদের চকোলেট বা কিছু খাবার দিয়ে 'ট্রিট' বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তা না হলে তারা একটা 'ট্রিক' অর্থাৎ দুষ্টুমি করবে। তাই ফ্রিজ থেকে একমুঠো চকোলেট বের করে খুদে অতিথিদের সন্তুষ্ট করেছিলাম।

কুমড়োর গ্রিক শব্দ 'লার্জ মেলন'-কে বলা হয় পেপন, ফরাসিরা পেপনকে করল পম্পন, ইংরেজরা পম্পনকে পাম্পিওন করে তুলল। সেখান থেকে নেটিভ আমেরিকানরা নাম দিল পাম্পকিন। সেই সময় আমেরিকায় এই 'পাম্পকিন'-এর চাষ ও ফলন ছিল প্রচুর। তাই মিষ্টি আলুর পরিবর্তে পাম্পকিন জ্যাকের লণ্ঠন হয়ে ওঠে। নেটিভ আমেরিকানরা কুমড়োর খোসা শুকিয়ে সেলাই করে মাদুর বানাত। তারা কুমড়োর পাতলা লম্বা লম্বা ফালি আগুনে সেঁকে খেত। বিশাল আকৃতির কুমড়োর মাথার দিকটা কেটে ভিতরের বীজ বের করে ফেলে দিয়ে খোলের মধ্যে দুধ, মধু ও নানা রকম সুগন্ধি মশলা ভরে সেই কুমড়োকে গরম ছাইয়ের মধ্যে রেখে 'বেক' করে খেত। সেই থেকেই হ্যালোইনের সময় 'পাম্পকিন পাই' খাওয়ার চল হয়েছিল।

এখনও আমেরিকায় দেখে এলাম, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকেই সবকটা শপিং মলে বিভিন্ন দামের ও স্বাদের পাম্পকিন-পাই আর ছোট বড় নানা আকৃতির পাম্পকিন বিক্রির ধুম। এক-একটা কুমড়ো একটা বড়সড় চেয়ারের মতো। তার ওপর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অনায়াসে বসতে পারে। আমাদের এখানে যেমন চৈত্র সেলের বাজারে হরেক জিনিস এক দাম, সেইরকম ছোট থেকে বিরাট—সব মাপের কুমড়োই পাঁচ ডলার মূল্যে পাওয়া যাচ্ছিল। 'পাম্পকিন'-এর উল্লেখ বিখ্যাত ইংরেজি রূপকথা 'The Legend of Sleepy Hollow', 'Peter, Peter, Pumpkin Eater', 'Cinderella' প্রভৃতিতে পাই।

হ্যালোইন-এর নিমন্ত্রণে আমরা

আন্তর্জাতিক বন্ধুচক্র (International Friends' Connection)-এর আমন্ত্রণে আমরা একটি হ্যালোইন পার্টিতে গেলাম। সেটা ছিল একটা শুক্রবার। সন্ধ্যাবেলা একটা চার্চের বিরাট হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। চার্চের নাম—'কর্নারস্টোন চার্চ'। ওদেশের নামকরণের সঙ্গে এদেশের তফাত লক্ষণীয়। ওদের রাস্তাঘাট, হোটেল-রেস্তোঁরা, মানুষ প্রভৃতির নামের মধ্যে প্রকৃতির ও বন্য জন্তুর নামের ছোঁয়া থাকে বেশি—

যেমন, উডস, স্টোন, রোড, ফরেস্ট, গ্রে-হাউন্ড, সিলভার ওলভস এইসব। কারণ ওদেশে প্রকৃতি প্রতিকূল—ঠান্ডা বরফের নদী খুঁড়ে জল বের করতে হয়, পাথর কেটে পথ তৈরি করতে হয়। মানুষ তীব্র কর্মপ্রেরণায় প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে জয় করে চলেছে। আর এদেশ সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে মায়ের মতো আরামের আদরের কোল পেতে রয়েছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্‌বিশ্বাসী। দেশের আনাচেকানাচে সর্বত্র মানুষের মনে ধর্মভাব প্রবল। তাই ছেলেমেয়ের নাম, ঘরবাড়ি, দোকানপাট—সবেতেই ঠাকুর-দেবতার নামের প্রাধান্য। যাই হোক, চার্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবীর গাড়ি এল। ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, নাম জেসিয়া। গিয়ে দেখি, চিন, জাপান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকেও অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছে। সবাই নানান মুখোশ পরেছে। হলের এক ধারে টেবিলে শরবত, কফি, নানারকম বিস্কুট, চকোলেট প্রভৃতি স্ন্যাক্সের আয়োজন করা হয়েছে। সামনে বড় স্টেজ সাজানো। সমস্ত হল জুড়ে অনেক টেবিলে রাখা রয়েছে বড় বড় কুমড়ো, চাকু ও মোমবাতি। প্রত্যেক টেবিলে বিভিন্ন গ্রুপ অনুযায়ী বোর্ড লাগানো আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের অংশগ্রহণকারীদের দল ভিন্ন ভিন্ন রঙের টি-শার্ট পড়েছে, যেমন 'ওয়ারেন ফ্যামিলি গ্রুপ' হলুদ গেঞ্জি, 'টুনস্ ফ্যামিলি গ্রুপ' কালো গেঞ্জি এইরকম। সকলের সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষ হলে শুরু হল 'শেপ আউট দ্য ল্যান্টার্ন' অর্থাৎ কুমড়োর ভিতরের শাঁস বের করে ফেলে লণ্ঠন তৈরির পালা। এক-এক দল তাদের টেবিলে রাখা কুমড়োর গায়ে এক-এক রকম ভূতের মুখ এঁকে নিল। তারপর সেই দাগ বরাবর চাকু দিয়ে কাটা হল। আমরা সোৎসাহে সব কটা টেবিলে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। সব ফাঁপা কুমড়োর ভিতরে মোম জ্বেলে সেগুলো সামনের বিচারকদের টেবিলে সাজিয়ে রাখা হল। তারপর ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে ভুতুড়ে মিউজিক চালানো হল। বেশ লাগছিল জ্বলজ্বলে চোখওয়ালা ভূতের মুন্ডুগুলো দেখতে। বিচারকদের ও দর্শকদের মিলিত রায়ে তিনটে জ্যাকের লণ্ঠন ও তিনজনের কিম্ভূত সাজ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা হল। প্রতিযোগিতা শেষ হল, অতএব জোরালো মিউজিক ও নাচ সহযোগে পার্টি শুরু হল। আমরা অল্প কিছু খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

ভারতে কার্তিক মাসে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে দীপদানের প্রথা আছে। কার্তিকী অমাবস্যায় মহানিশায় হয় শ্রীশ্রীমহাকালীর পূজা। ঠিক তার আগের রাতটি ভূত চতুর্দশী। ওইদিন সমস্ত গৃহ দীপমালায় সজ্জিত হয়। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে, আমাদের পূর্ব পূর্ব মৃত বংশধরগণ বিদেহলোক থেকে মর্ত্যলোকের খুব কাছাকাছি নেমে আসেন এবং আমরা তাঁদের দীপের আলোয় পথ দেখিয়ে বলি, ''আমরা তোমাদের সন্তানসন্ততি, আমরা তোমাদের ভুলিনি, আমাদের আশীর্বাদ করো।'' দেশ, ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস সব আলাদা, কিন্তু কোথাও যেন সব এক সুরে বাঁধা! মনপ্রাণের চাওয়া-পাওয়াগুলো কেমন যেন মিলে যায়! তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎসবের উৎসে খুঁজে পাওয়া যায় আত্মিক মিলনের সুর! হিন্দুর দীপাবলি উৎসব, যা কিনা আলোর উৎসব, তা এই সো-ইন-এর সময়েই উদ্‌যাপিত হয়। বহুকাল আগে হিন্দুর নববর্ষের সূচনা হত দীপাবলি উৎসবের মধ্য দিয়ে, তেমনই কেলটিক নববর্ষ সূচক উৎসব ছিল সো-ইন। হয়তো বা দীপাবলি ও সো-ইন-এর সুদূর কোনও প্রাচীন সম্বন্ধ আছে।

থ্যাংকস গিভিং

হ্যালোইনের মতোই আমেরিকার আর এক বড় উৎসব হল 'থ্যাংকস গিভিং', অর্থাৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি পাবলিক

হলিডে হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার। এর প্রথম সূত্রপাত ফসলের উৎসবরূপে। আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে আমেরিকান কংগ্রেস একটি ফেডেরাল ছুটির দিন দাবি করেছিল এবং তারপর থেকেই (১৭৮৯) মাঝে মাঝে এই দিনটি পালিত হত। ১৮৬৩ থেকে, আমেরিকার সিভিল যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন স্বর্গস্থ পিতার (খ্রিস্ট) উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য একটি দিন ছুটি হিসাবে ধার্য করেন, সেটিই নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার স্থির হয়। তখন থেকেই খ্রিস্টমাস ও নিউ ইয়ারের মতো থ্যাংকস গিভিং-ও একটি শীতকালীন ছুটির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

উৎসবের উৎসমুখ

আমাদের দেশে যেমন নতুন ধান উঠলে তাই দিয়ে ভোগ রেঁধে দেবতাকে নিবেদন করা হয়, পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে নতুন চালের পিঠে-পায়েস খাওয়ানো হয়—গ্রাম-বাংলায় পরিচিত সেই ‘নবান্ন’ উৎসবই এখানে থ্যাংকস গিভিং। সারা বছর পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনের আশীর্বাদ করেছেন ভগবান, তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভগবানকে এরা ধন্যবাদ জানায় ও সেইসঙ্গে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করে ও ভূরিভোজের আয়োজন করে। আমেরিকায় মূলত এটি একটি সপরিবার আনন্দোৎসবের দিন—এক বিরাট নৈশভোজ উপলক্ষ্য করে কাছে-দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়। থ্যাংকস গিভিং-এর নাম উল্লেখ করা মাত্রই এর অপরিহার্য অনুসঙ্গ হিসেবে মনে আসে, একটি আস্ত ঝলসানো টার্কি ও ভুট্টা সিদ্ধ। আর কিছু থাক বা না থাক, এই দুটি অতি অবশ্যই ডিনারের মেনুতে থাকবে। এখন মূল উৎসবের উৎস সন্ধানে যাওয়া যাক।

আমেরিকায় এই দিনটির শিকড় প্রায় চারশো বছর আগেকার। ভার্জিনিয়ায় ১৬০৭ সালে এই উৎসব হয়েছিল, পালন করেছিল একদল নতুন অধিবাসী, যারা এক অনুকূল ধর্মাচরণের স্থান সন্ধান করতে করতে আমেরিকার ‘নিউ ইংল্যান্ড’ উপকূলে প্লিমাউথ রকে এসে পৌঁছেছিল। ইতিহাসে এরা ‘পিলগ্রিম’ অর্থাৎ তীর্থযাত্রী নামে প্রসিদ্ধ। ১৬২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ১০৪ জনের একটি ‘পিলগ্রিম’ দল ‘মে-ফ্লাওয়ার’ নামের একটি জাহাজে করে কঠোরভাবে বাইবেলের অনুশাসন মান্য করবার জন্য নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করেছিল। ওই দলে ছিল একান্ন জন পুরুষ, কুড়ি জন মহিলা, বাইশটি ছেলে ও এগারোটি মেয়ে। ছেষট্টি দিন ধরে সামুদ্রিক দুর্যোগের মোকাবিলা করে তারা প্লিমাউথ রকে এসে নামল। তখন সেখানে অত্যন্ত ঠান্ডা। তাদের শীতের প্রস্তুতি ছিল না। সুরক্ষিত আশ্রয় ও খাদ্যের অভাবে বসন্তকাল আসার আগেই দলের প্রায় অর্ধেক মানুষ মারা গেল। চরম প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করে বেঁচে রইল মাত্র পঞ্চান্ন জন। নেটিভ আমেরিকানরা (তখনকার রেড ইন্ডিয়ানরা) বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। নেটিভ আমেরিকানদের মধ্যে বিশেষ করে স্কোয়ান্টো নামে এক ব্যক্তি পিলগ্রিমদের শেখালেন কীভাবে শিকার করতে হবে, কীভাবে মাছ ধরতে হবে। তাদের সহায়তায় নতুন দলটি চাষ-আবাদ করল। শরৎ ঋতু তাদের জন্য বয়ে আনল আনন্দের সংবাদ—প্রচুর আশাতীত ফসল উৎপাদিত হল। তখন ওই দলের নেতা উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড একটি বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন, নিমন্ত্রণ জানালেন স্থানীয় অধিবাসীদের। ফসলের প্রাচুর্যের জন্য, ঈশ্বরের অকৃপণ দানের জন্য, নতুন বসতি স্থাপনের অগ্রগতির জন্য, সকলে মিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করলেন ভোজসভা। পঞ্চান্ন জন মানুষ

স্থানীয় জঙ্গল থেকে শিকার করা টার্কি (বন-মোরগ), হাঁস ও হরিণের মাংস, সমুদ্র থেকে ধরা প্রচুর মাছ ও ভুট্টা, নানা ধরনের ফল প্রভৃতি সহ প্রভূত খাবারের আয়োজন করেছিল। নিমন্ত্রিত নেটিভ ছিল ৯০ জন। খাওয়াদাওয়া, নানা ধরনের খেলাধূলা, নাচগানের মাধ্যমে তিনদিন ধরে চলল উৎসব। এইভাবে হল প্রথম 'থ্যাংকস গিভিং' উদ্‌যাপন। ধীরে ধীরে এটি একটি বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হল এবং আমেরিকার অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ল।

আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উৎসব পালন করত। যুদ্ধের অনেক বছর পরে, ১৭৮৯-এ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখটিকে 'ন্যাশনাল থ্যাংকস গিভিং ডে' হিসাবে ঘোষণা করে বলেছিলেন, "Whereas it is the duty of all nations to acknowledge the providence [sovereignty] of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly to implore [beg] His protection and favor... Now, therefore, I do appoint Thursday, the 26th day of November 1789... that we may all unite to render [give] unto Him our sincere and humble thanks for His kind care and protection."

থ্যাংকস গিভিং-এর নিমন্ত্রণে আমরা

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য—পরপর দুটি নিমন্ত্রণ পেলাম, একটি সেই IFC (International Friends' Connection) থেকে, আয়োজন করেছিল ওদের ভারপ্রাপ্ত কর্ণধার মি. হ্যারল্ড ও তাঁর চাইনিজ স্ত্রী সানি। বিশ্বের সব দেশ থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসের বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সকলকে একত্র করত ওরা, সেই সূত্রে পরিচয় ও পরিণয়। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার এই হ্যারল্ডের, ওর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হ্যালোইনের সময়। নতুন আগন্তুক আমাকে দেখে ও নিজেই এগিয়ে এসেছিল আলাপ করতে। খুব শখ ভারতে আসার। আমার দেশ কেমন, সেখানে এমন উৎসব হয় কি না—নানা প্রশ্ন করেছিল আমাকে। এবার থ্যাংকস গিভিং পার্টিতে ওদের ঘরে আমাকে পেয়ে বিশেষ অতিথির মর্যাদা দিয়ে নিয়ে গেল সোজা ওদের স্টাডিতে। সেখানে অতি যত্নে সাজিয়ে রাখা তামিলনাড়ুর একটি তিন চাকা অটো রিক্সার ছবি। এটা ওর কাছে ভারতের একটা 'মিনি' চিত্র। আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের দেশেও ভগবানকে ধন্যবাদ জানানোর এরকম বিশেষ দিন আছে কি না! আমি প্রায় ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম, ওদের বোঝালাম, আমাদের দেশের কেবল একটিমাত্র দিন নয়, বরং প্রত্যেকদিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতে থাকি, আমাদের সুখদুঃখের সকল মুহূর্তে তিনিই একমাত্র আশ্রয়, তিনি আমাদের পরম ধন, আমাদের হৃদয়-সর্বস্ব, আমাদের জীবনে সর্বদা, সর্বথা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি। তারপর অন্ন গ্রহণের আগে প্রতিদিন আমরা ভগবদ্‌গীতার যে-পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করি—'ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'—এর অর্থ বুঝিয়ে বললাম। ওরা কতটুকু বুঝল, জানি না, তবে হাঁ করে শুনল।

প্রথমে ফল দিয়ে ভোজ শুরু হল। প্রায় পঞ্চাশ রকমের ফল আর এত সুন্দর করে সাজিয়ে সে-সমস্ত পরিবেশন করা হল, তা দেখার মতো! এক একটি ফলের নানা রকমফের, যেমন আঙুরের

মধ্যে লাল, সবুজ, কালো, হলুদ নানা রঙের ও নানা আকারের আঙুর। তেমনই আপেলের ভিন্ন ভিন্ন রং। নানা প্রজাতির মেলন, ক্যান্টালুপ, স্ট্রবেরি, ব্লু বেরি, র‍্যাস্পবেরি, গুজবেরি ব্লু—হরেক জাতের বেরি। এরপর সবাই গেলাম ডিনার টেবিলে। বিচিত্র সব খাবারদাবারে টেবিল যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম। ওদেশে নিয়ম হল, নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রান্না করে নিয়ে আসে আর সবার আনা খাবার ও আয়োজক পরিবারের রান্না করা সব খাবার একসঙ্গে টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবাই পছন্দমতো নিয়ে খায়। আমি কাজু-কিশমিশ-ঘি দিয়ে বাসমতি চালের সুগন্ধি মিষ্টি পোলাও বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সবাই দেখলাম শেষ পাতে ওই পোলাও নিয়ে চেটেপুটে খেল। মেন কোর্স খাওয়া শেষ হলে এল ডেজার্টস, অর্থাৎ মিষ্টান্ন। কেক-পেস্ট্রি-পুডিং-আইসক্রিম-চকোলেট-ডোনাট ইত্যাদির এত বিপুল আয়োজন যে সবকটি চেখে দেখারও সময় পাইনি। অনুষ্ঠানের শেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। প্রত্যেককে বলতে বলা হল, তার জীবনের গত এক বছরের এমন কিছু ঘটনার কথা, যার জন্য সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চায়। আমার দিক থেকে এটাই বলার ছিল যে, ঈশ্বর আমাকে একটি নতুন দেশ দেখার ও নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, নতুন সংস্কৃতিকে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন, আমি ধন্য।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে আমরা জড়ো হলাম বৈঠকখানায়। অতিথিদের মধ্যে দু-একজনকে দূরে যেতে হবে, আবহাওয়া খারাপ—তাই সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। বাইরের দরজা খুলতেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়া যেন সূচের মতো গায়ে বিঁধল! অথচ ঘরের ভিতর সেন্ট্রাল রুম হিটিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় বাইরের দুর্যোগ কিচ্ছুটি টের পাওয়ার জো নেই। হ্যারল্ড আমাদের সকলের হাতে একটি করে প্রার্থনা লেখা কাগজ দিল। সমবেতভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই প্রার্থনা পাঠ করা হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৮৬৩ সালে আমেরিকার ষোলোতম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারকে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' হিসাবে ধার্য করে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। সেটি ভারি সুন্দর : ''We often forget the source from which the blessings of fruitful years and healthful skies come... No human wisdom has devised nor has any mortal [human] hand worked out these great things. They are the gracious gifts of the Most High God... I therefore invite my fellow citizens in every part of the United States... to observe the last Thursday of November as a day of thanksgiving and praise to our beneficent [good] Father who dwells in the heavens."

বাইরে তখন অঝোরে তুষার ঝরে পড়ছে। বাইরে ও ঘরের ভিতরে তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য কাচের জানলাগুলো ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। মোমবাতির আলো। সব মিলিয়ে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শেষ হল অনুষ্ঠান।

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যে যেমন সুবিধা পেয়েছে, থ্যাংকস গিভিংয়ের আয়োজন করেছে। হ্যারল্ডের বাড়িতে যেদিন গেলাম, তার চারদিন পরে নিমন্ত্রণ এল লুইসের বাড়ি থেকে।

ছেলের রিসার্চ ল্যাবের বন্ধু লুইস। ওর স্ত্রী মনিকা ভেনেজুয়েলার মেয়ে, আমার বাজার যাওয়ার সঙ্গিনী ছিল সে। ভারি ফুটফুটে মিষ্টি ছয় ও দশ বছরের দুটি ছেলে ওদের—জুলিয়ান আর আদ্রিয়ান। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর লুইসের বাবার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় ওকে পারিবারিক

ব্যবসা দেখাশোনার জন্য উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে ইতি টানতে হয়েছিল। তাই অনেক বছর পরে ও পুরনো স্বপ্ন পূরণ করতে রিসার্চে এসেছে। ওদেশে লেখাপড়ায় বয়সের শেষ সীমা বলে কিচ্ছু নেই। পড়ুয়ার ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকাটাই আসল। খুব যত্নে সাজানো লুইস-মনিকার সংসার। ওদের ফায়ারপ্লেস থেকে শুরু করে কাঠের ঝুলবারান্দা, বইয়ের র‍্যাক, বেসমেন্ট, কিচেন-গার্ডেন সবকিছুই ছবির মতো সুন্দর। ওদেশে খাওয়াদাওয়া শুরুর আগে কিছুটা মদ্যপানের রীতি আছে। আমাদের তো সেসব চলবে না। অগত্যা আমাদের কফি দেওয়া হল। মেশিনে কফি বিনস পিষে ক্রিম ও মধু দিয়ে যে-কফিটা লুইস বানিয়ে দিল, তা স্বাদে ও গন্ধে এককথায় অনবদ্য। সেদিন খুব ঠান্ডা ছিল, প্রায় মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি। ঘরদোর, বইপত্র ঘুরে ঘুরে দেখার পর আমরা ডিনার টেবিলে এলাম। বাড়ির সবাই টেবিল সাজাতে হাত লাগাল—খুদে দুটো পর্যন্ত! ওভেন থেকে বের করা হল ঝলসানো টার্কি, ছোট আলু সিদ্ধ, কচি মিষ্টি ভুট্টা সিদ্ধ, ঘরে বেক করা বিশেষ পাউরুটি, বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো দেশি সস, ক্র্যানবেরি সস, সুইট চিজ, স্যালাড, মাফিন, এগ-স্টাফড ব্রেড, গ্রিলড চিকেন ও আরও কত কী এখন মনে নেই। ও হ্যাঁ, এখানেও ফলের আয়োজন ছিল। আমি ওদের জন্যও ওই বিশেষ পোলাও রেঁধে নিয়ে গিয়েছিলাম। যথারীতি এখানেও আমার রান্না পোলাও-এর কদর হল। ভোজন-পর্ব শুরু হওয়ার আগেই সবাই চোখ বন্ধ করে গভীর ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ জানাল : ''With thankful hearts, we praise our God who like a loving parent denies us no good thing. Heavenly Father, on Thanksgiving Day, we bow our hearts to You and pray. We give You thanks for all You've done, especially for the gift of Jesus, Your Son."

এদের এক রীতি হল সব খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে শেষে টেবিলে বসে গল্প করতে করতে কফি খাওয়া। ডাইনিং টেবিলে বসেই অনেকক্ষণ আড্ডা হয়। পার্টি শেষের ইঙ্গিত—লম্বা কাচের গ্লাসে করে এক গ্লাস কনকনে ঠান্ডা জল দেওয়া। খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে ওটা শেষ করে বিদায় নিতে হয়। দুটো জিনিস আমার খুব অদ্ভুত লাগত। আমরা সাধারণত গরম ও ঠান্ডা পানীয় পরপর পান করি না। কিন্তু এরা কফি খাওয়ার পরে ঠান্ডা জল খায় আর বাইরে বরফ পড়লেও কনকনে ঠান্ডা বরফ জলই খায়। দুটি বাড়িতে থ্যাংকস গিভিং-এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, এদের খাওয়া-দাওয়া দেখে আমার স্বামীজীর একটি চিঠির কথা খুব মনে পড়ছিল—''ভাল কথা, এখানে ইলিশ মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, নেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল ক্যালিফোর্নিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

''এক রকম শাক আছে, Spinach—যা রাঁধলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মতো খেতে লাগে, আর যেগুলোকে এরা Asparagus (এস্পারেগাস) বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে 'গোপালের মার চচ্চড়ি' নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটি আছেন, হর-রঙের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মতো। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখন তো আছেন, আর বরফ-জল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জ্বর—এন্তের বরফ-জল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দিতে

বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের নানা আকারের।" (মঠের সকল গুরুভ্রাতাকে লক্ষ করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র)

মধুরেণ সমাপয়েৎ

আমাদের প্রাণের রবি-কবি বলেছেন, ''দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'', সেকথা মর্মে গেঁথে সব খুঁটিয়ে দেখেছি, প্রশ্ন করে জেনেছি, সাধ্যমতো আমাদের উৎসবরীতি সম্বন্ধে তাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, মনে মনে সবসময় দুই ধারার তুলনা করেছি, কিন্তু এটা স্থির করেই রেখেছিলাম যে, কখনও সমালোচনার আঙুল তুলব না। প্রত্যেক দেশের, জাতির ও ধর্মের মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস ভিন্ন, আর সেই ভিন্নতা থেকেই তাদের ধর্মাচরণ ও উৎসব পালনের রীতিনীতিও ভিন্ন। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের দোলের দিনে রং মেখে মাতামাতি, কালীপুজোর বাজি পোড়ানো ওদের চোখ কপালে তোলে, তেমন আমাদেরও ভ্রূকুঞ্চিত হয় ছেলেবুড়ো সকলের একত্রে মদ খাওয়া ও নাচানাচি করা দেখলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঠান্ডার দেশে গা-গরম করার জন্যই ওগুলো উৎসবের অঙ্গ। ঠিক একইভাবে বসন্তে চর্মরোগের নিবারণে ও শীতের সূচনায় পোকামাকড়ের উপদ্রব কমাতে আমাদের দেশে রং মাখা ও বাজি পোড়ানোর চল হয়েছিল প্রাচীনকালে—পরে তা মানুষের উদ্ভাবনী আবেগে ও কিছুটা বাণিজ্যিক কারণেও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সকল উৎসব পালনের মূলে থাকে প্রাণের মিলনের আকুতি! শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে একত্রে মিলিত হয়ে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে এক মহামিলনের ভাবে আনন্দে মেতে ওঠা! তাই দেশ-কাল-পরিস্থিতি যতই ভিন্ন হোক না কেন, অন্তরের চাওয়ার একত্বে দেশ-কালের সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়—পড়ে থাকে শুধু আনন্দ—''তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে এলো এলো এলো গো ওগো পুরবাসী!''✠

তথ্যসূত্র

a. An excerpt from Tlachtga : Celtic Fire Festival by John Gilroy.
b. www.history.com>Halloween/jack o lantern
c. www.pumpkinnook.com>facts/jack-html
d. www.merriam-webster.com> words at play/history oh jack o lantern
e. https://www.en.wikipedia.org> (1) history of thanksgiving in america; (2) harvest festival, (3) Haloween, (4) Indigenous peoples of America, (5) Pilgrim Fathers
f. www.smithsonianmag.com smart news trick or treating